পুরাতন বাংলা গান

যে যুগে বাঙালি গাইয়েরা ধ্রুপদ গানে মুখর সে যুগে বাংলা গান যে ধারায় চলেছে তার গতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তার কায়দা, রূপায়ণ, গায়নভঙ্গি এবং আবেদন একেবারেই অন্যরকম। যে ওস্তাদ প্রচণ্ড দাপটে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গাইলেন, তিনিই যখন বাংলা গান গাইতে বসলেন তখন তাঁর ধরনটা পালটে গেল, কণ্ঠ মসৃণ হয়ে গেল, ফুটে উঠতে লাগল টপ্পার দানাদার ফুলকি, একটা ভাবাবেগ যেন তাঁকে মন্ত্রবলে সমাহিত, ধ্যানস্থ করে গেল। অবশ্য সব সময়ই যে এটা হত তা নয়, এই বছর-কুড়ি আগেও এক বাঙালি ধ্রুপদীর মুখে শুনেছিলাম 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে'। এমন মনোহর টপ্পাকেও তিনি যেন দুন, বাঁটের ফরমুলায় ফেলে একেবারে লড়াই করতে লেগে গেলেন। প্রতি বার সমের মুখে এসে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে যেভাবে মেঝের ওপর খোঁচা দিচ্ছিলেন তাতে সিমেন্ট না হয়ে মাটি হলে তার চার পাশ গর্তে গর্তে ছেয়ে যেত নিশ্চয়। তিরিশের দশকে এরকম কয়েকজন গাইয়ে ছিলেন কলকাতায়, যাঁরা প্রচুর পুরাতন বাংলা গান জানতেন কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তবলার সঙ্গে যুদ্ধ করাই ছিল তাঁদের আদর্শ। আসর পণ্ড করবার দরকার হলে লোকে এঁদের ডেকে আনত। কিন্তু, এটা নিতান্তই ব্যতিক্রম। যাঁরা যথার্থ ভালো গাইয়ে ছিলেন, বা বাংলা গান সৃষ্টি করে গেছেন তাঁরা কখনোই এভাবে গাইতেন না, কারণ তা হলে উদ্দেশ্যটাই বিফল হয়ে যেত।

এই উদ্দেশ্যটা যে কী—সেটা বহুদিন ধরে চিন্তা করে এসেছি। হিন্দুস্থানী গান, দরবারী গান—তার গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখতে সেই ওজনের দৃঢ়তা চাই, স্থৈর্য চাই; কিন্তু বাংলা গান ঘরোয়া গান—তাকে সমস্ত স্নেহ মমতা দিয়ে প্রকাশ করতে হবে—এই মনোভাবই হয়তো এই দুই ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। তথাপি বড়ো বড়ো আসরে গাইতে বসেও অনেক ওস্তাদ, কেবলমাত্র ধ্রুপদ ধামার গেয়েই ক্ষান্ত হতেন না,

দু-চারটে বাংলা টপ্পা বা রঙিন গান শুনিয়ে একটা সুগভীর আত্মতৃপ্তি নিয়ে তাঁদের অনুষ্ঠান শেষ করতেন। গায়কীর এই বেশ-খানিকটা প্রভেদে শ্রোতারাও খুশি হতেন, চমৎকৃত হতেন।

হিন্দুস্থানী গানের পাশাপাশি বাংলা গান এইভাবে দুই শতাব্দী ধরে নানা রূপে-রসে, নানান ধারায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীতে দেখা যায় বাংলা গান একটা বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। যদিচ বাংলা গানের ভিত্তি ধ্রুপদ নয়, তথাপি রাগসংগীতের এ যে একটি মনোরম লীলাভূমি সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কারা একে এত উৎকৃষ্টভাবে রূপায়িত করলেন এবং এত মনোরম করে তুললেন? এর উত্তরে বলতে হয় তাঁরাই বাংলা গানকে রমণীয় করবার ভার নিয়েছিলেন, হিন্দুস্থানী গানে যাঁদের পারদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। নিধুবাবু ওস্তাদ হয়ে বাংলা গান রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কালী মীর্জা তো নামকরা ওস্তাদ ছিলেন। রাধামোহন সেন গান গাইতেন না, কিন্তু তাঁর গান যাঁরা গাইতেন তাঁরা রাগসংগীতে পারদর্শী ছিলেন। শ্রীধর কথক কীরকম গাইতেন, আমরা জানি না, হয়তো তেমন ওস্তাদ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর গানগুলিতে রাগসংগীতের নানারকম স্টাইল দেখা যায় যা অপর অনেকের রচনায় দুর্লভ। এটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তা হলে দেখতে পাব যোগ্যতম বাঙালি গায়কেরা যোগ্যতার উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে যে বাংলা গান রচনা করেছেন তা প্রথম থেকেই পরিপক্ক বা 'ম্যাচিওর' রচনা; তা গোড়া থেকেই এত অসাধারণ যে পাকা গাইয়ে ছাড়া এ-সব গান গাইবার পারদর্শিতা আর কারো থাকবার কথা নয়। পরিচিত থেকে অপরিচিত বহু কূটরাগই বাংলা গানে প্রযুক্ত হয়েছে; তালের বেলাতেও তাই—একতাল, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, যৎ—এ-সব তো আছেই, তা ছাড়া আছে আড়াঠেকা, যা আজকাল প্রায় অজানা বললে অত্যুক্তি হয় না কিন্তু তখন ছিল প্রায়শই প্রচলিত। আজকাল হলে অধিকাংশ শিল্পী তাল ছাড়াই এ-সব গান গাইতেন (অন্তত বেতারে তো বটেই), কিন্তু সেকালে তবলা ছাড়া গাইয়ে একান্ত উপহাসের পাত্র ছিলেন এবং এ-সব গানই তাঁদের বেশ দক্ষতার সঙ্গে তালে গাইতে হত। আর এ-সব গান তালে মজা করে গাইলে সে যে কী অপূর্ব শোনায় তা যাঁরা এ-সব গান সেভাবে শুনেছেন একমাত্র তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারেন। পুরাতন বাংলা গানের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম। প্রতিটি গানের বাঁধুনি এত নিটোল যে গান যখনই এসে সমে পৌঁছোচ্ছে তখনই মনে হচ্ছে ঠিক এখানে এভাবে শেষ না হলে গানের রস-হানি ঘটত। আর, সবচেয়ে বিচিত্র হচ্ছে কথা বা কাব্যের দ্যোতনার সঙ্গেই এ সমের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল; সমে পৌঁছোলেই মনে হত কাব্যের অনুপম আবেদন যেন ঠিক তার

স্বাভাবিক আকৃতিকে নিয়ে সবচেয়ে অনুকূল সময়ে এসে মর্মে তার আঘাত হেনে গেল। যাঁরা লালচাঁদ বড়ালের 'ধিন তা ধিনা পাকা নোনা'-জাতীয় গান শুনে বাংলার পুরাতন বাংলা গান সম্বন্ধে ধারণা করেছেন তাঁরা হয়তো ঠিক আন্দাজ করতে পারেন নি, কেননা এ-সব গান পুরাতন বাংলা গানের আদৌ প্রতিনিধিত্ব করে না : কিন্তু তথাপি তান-বৈচিত্র্যে তাঁরা মুগ্ধ হবেন নিশ্চয়। লালচাঁদ গানের সেন্টিমেন্টকে সব ক্ষেত্রে তেমনভাবে রাখতেন না, কিন্তু তান এবং গিটকারিতে তিনি অতুলনীয়। তবে, তিনি দ্রুত তানেই বেশি অভ্যস্ত ছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী যখন 'সোহাগে মৃণাল ভুজে' গাইতেন তখন ফুটে উঠত বাংলার চাল, বাংলার সেন্টিমেন্টকে তিনি বহুল পরিমাণে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তাঁর অপূর্ব গায়ন-শৈলীতে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী এ-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক যিনি পুরাতন বাংলা রাগসংগীতের সুষমাকে বহুধারূপে ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর গানে। তাঁর তানকর্তব ছিল খেয়াল অঙ্গের কিন্তু বিস্তার, লালিত্য, নানারকম টেকনিক ছিল বাংলা গানের। দুই-এর একটা বিচিত্র সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছিলেন তাঁর গানগুলিতে। কয়েক বৎসর পূর্বে কালীপদ পাঠক প্রয়াত হয়েছেন ঠিক আশি বৎসর বয়সে। তাঁর গানের স্টাইল ছিল অত্যন্ত অন্তর্গূঢ়। প্রত্যেকটি বিস্তার তিনি মনোবিশ্লেষণ করে করতেন—এই কারণে গানের ভাবমূর্তি তাঁর গানে যেন রূপ ধরে ফুটে উঠত। করুণ শৃঙ্গার এবং ভক্তিরস—এ দুটিতেই তাঁর বৈদগ্ধ্য ছিল অসাধারণ। তাঁর সুললিত বিস্তার কখনো গানের ভারসাম্যকে অতিক্রম করত না। যাকে অ্যাকাডেমিকভাবে শেখা বলে তিনি তেমনিভাবেই বাংলা গান শিখেছেন—মায় যাত্রা, পাঁচালি পর্যন্ত। তালে ছিলেন অসাধারণ পাকা। যে-কোনো তালে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে গানের সমস্ত ফর্ম ও বাংলার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে গেয়ে যেতেন। বহু গায়কের তথা গায়িকার গান তিনি শুনেছেন, বহু ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জীবনের একেবারে বাল্যকাল থেকে আশি বৎসর পর্যন্ত অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে কেবল বাংলা গানের আলোচনা, শিক্ষা ও বিশ্লেষণ নিয়ে কাটিয়ে গেলেন। সংগীতের দিক থেকে এতবড়ো দেশপ্রেমিক ক'জন মেলে?

বাংলার রাগসংগীত যা আমরা ইতিহাসের পটভূমিকায় পাচ্ছি তা রামপ্রসাদের সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রামপ্রসাদ যে কেবল প্রবাসী সুরের স্রষ্টা হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন তাই নয়, তিনি রাগসংগীতেও দক্ষ ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর অনেক গান তথাকথিত প্রসাদী সুরে গাওয়া হয়ে আসে নি, তাদের চাল সম্পূর্ণ আলাদা। 'এমন দিন কি হবে তারা' গানটি এখনো অনেকেই গেয়ে থাকেন। পুরাতন সংগীত-সংগ্রহ গ্রন্থাদিতে এর সুর 'সিন্ধু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখনো এটি সিন্ধু-কাফিতেই

গাওয়া হয়। টপ্পা গাইয়েরা এ-গানটি টপ্পার চালেই গেয়ে আসছেন। এই সিন্ধু-কাফি সুরটি সেকালকার বাংলার একটি অতীব জনপ্রিয় সুর। কত গান যে এই সুরে আছে তা বলা যায় না। এ-সব সুরের একটা প্রকৃতিই হয়ে গিয়েছিল যা বাংলার নিজস্ব। অনেকে নিঃসংশয়ে শুদ্ধ গান্ধার লাগিয়ে অপূর্ব রসসৃষ্টি করতেন। শ্রীধর কথকের প্রসিদ্ধ গান 'যে যাতনা যতনে' কিংবা কালী মীর্জার 'আমি ঐ ভয়ে মুদি নে আঁখি', এই দুটিতে শুধু শুদ্ধ গান্ধারই নয়, শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগও বেশ বলিষ্ঠভাবেই দেখা যায়। সব মিলিয়ে ঢঙটি ফুটে উঠত সিন্ধু-কাফির। কমলাকান্তের 'মজিল মন ভ্রমরা' (অধিকাংশ শিল্পী 'সজল আমার মন ভ্রমরা গেয়ে' থাকেন) এই গানটিও একটি প্রসিদ্ধ সিন্ধু-কাফি। এতেও একই স্টাইল দেখা যায়। এ-সব গানই বাংলার সুপরিচিত শৈলীতে গাইতে হয়। হিন্দুস্থানী ঢঙে গাইতে গেলেই এর সব রস মাটি হয়ে যাবে। তবে এখানে একটি কথা বলে রাখি—অন্যান্য গানের ক্ষেত্রেও এ কথা বলা যায়। পুরাতন বাংলা গান সকলে যে সবগুলি একই সুরে গান এমন নয়, অনেক গানে অনেকে সুর পালটে নিজেদের পছন্দমতো সুর বসিয়ে নেন, কিন্তু কতকগুলি গান আছে, যাদের সুর পালটালে সেটা ঐতিহ্যের প্রতি অবমাননা বলে পরিগণিত হবে; এই প্রচেষ্টা না করাই যুক্তিযুক্ত। ধরা যাক, 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে' গানটি যদি কেউ চিরপ্রচলিত খাম্বাজে না গেয়ে বাগেশ্রীতে গান করেন, তা হলে সেটি মেনে নেওয়া কঠিন হবে, এমনটা করাই সংগত নয়। কিন্তু এমন কোনো কোনো গান আছে, যাতে সুরান্তর আছে; তবে তার গাইবার স্টাইল কিন্তু পুরাতন ঐতিহ্যকেই মেনে চলে। যদি কেউ খাম্বাজে না গেয়ে কোনো গান বেহাগে গান, তা হলে সেই বেহাগও তার পুরাতন ট্র্যাডিশনকেই মেনে চলে, অর্থাৎ পুরাতন বাংলা বেহাগের বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করে না। আবার দু-একটি সিন্ধু-কাফির উল্লেখ করি সেগুলির কিছু ইতিহাস আছে বা অপর বৈশিষ্ট্য আছে। নিধুবাবুর নামে একটি গান প্রচলিত আছে, সেটি সিন্ধু-কাফিতে গাওয়া হয়, যদিও খুম কম শিল্পীই অধুনা এই গানের সঙ্গে পরিচিত। গানটি হচ্ছে—

শ্রীমতীর মন মানেতে মগন
ওখানে এখনো যেও না
বিষাদের বাতি জেলেছেন শ্রীমতী
তাহাতে আহুতি দিও না।
নিবেদন করি ফিরে যাও হরি
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেকো না
কত নারীর সঙ্গ, করেছ কি রঙ্গ
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁয়ো না।

এমন মধুর সিন্ধু-কাফি বেশি শোনা যায় না। কথিত আছে নিধুবাবুর প্রণয়িনী শ্রীমতী বহুদিন পর্যন্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তিনি ফিরলেন বেশ কিছুদিন কাটিয়ে। অথবা কোনো কারণে শ্রীমতী নিজেকে খণ্ডিতা মনে করেছিলেন। এইরকম কোনো একটি ঘটনায় শ্রীমতীর অভিমানকে উপলক্ষ করে এই গানটি রচিত হয়েছিল। এইরকম আর-একটি নিধুবাবুর গান আছে—'ভাবিতেছিলাম যারে সেই আমি প্রকাশিল' (ঝিঁঝিট খাম্বাজ)। এটিও শ্রীমতীর অভিমানকে অবলম্বন করে রচিত বলে শোনা যায়। কিন্তু 'শ্রীমতীর মন মানেতে মগন' গানটি এই লেখকের কাছে নিধুবাবুর রচনা বলে মনে হয় না, কারণ নিধুবাবু ঠিক রাধাকৃষ্ণকে উপলক্ষ করে গান লেখেন নি। এই গানটি অপর কারো রচনা বলেই মনে হয়। এই অংশটি রাসু-নৃসিংহের পালায় একটি বড়ো মনিসম্বাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে একটি-দুটি বাড়তি পদও আছে যা টপ্পায় গাওয়া হয় না। কিন্তু তা হলেও এটি একটি বহুকালের ট্র্যাডিশন—এর সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে সত্য উক্তি করা কঠিন ব্যাপার। দাশু রায়ের পাঁচালিতে একটি গান আছে—'ওগো সজনি রাই অঙ্গ সাজাব দিয়ে কি ভূষণ'। এর সুরও মোটামুটি সিন্ধু-পাখি, কিন্তু 'ওগো সজনি' এই অংশটুকু দোলায়িত টপ্পায় কোমল ধৈবত ছুঁয়ে যায়। হঠাৎ যেন পিলুতে ঠুংরির আমেজ ফুটে উঠেছে। বরাবরই এই গানটিতে একটু কোমল ধৈবতের স্পর্শ লেগে একে মনোহারিত্ব প্রদান করেছে। তবে পাঁচালি গান হওয়াতে গানটিতে বেশ-একটু অভিনয়ের ঢঙ আছে। সেইটি বজায় রেখেও ক্ল্যাসিকাল স্টাইলে এই গানটি বেশ ভালো করেই গাওয়া যায়। ঠুংরির উল্লেখে একটি কথা মনে পড়ে গেল। কোনো কোনো প্রাচীন গায়ককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম টপ্পা-ঠুংরির মিশ্রণে বাংলায় কোনো গান রচিত হয়েছিল কিনা। তাঁরা কেউ-ই এ বিষয়ে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেন নি, যেমন টপ্পায় 'সরগম' করার প্রস্তাবে তাঁদের উৎসাহ দেখি নি; তবে একটি গান শুনেছিলুম যাকে টপ্পা-ঠুংরি বলা যায়। গানটির কথা আমার মনে নেই, প্রথম লাইন—'আমি তিলেকেরি তরে তারে দেখেছি সজনি।' অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় এই গানটি চমৎকার গাইতেন। এটি তাঁর একটি প্রিয় গান ছিল। গানটি বোধ হয় তেমন প্রাচীন নয়, কারো গ্রামোফোনে রেকর্ড ছিল। এমন কত গানই আছে। বিনোদিনীর গাওয়া 'ধীরে তীরে কর পার' (বেহাগ-খাম্বাজ) এইরকম একটি চমৎকার গান। এ-সব গানের স্টাইল পুরোনো দিনের—এই হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য।

সিন্ধু-খাম্বাজও পুরাতন বাংলা গানে অপ্রচলিত নয়। কিন্তু, এই রাগনির্দেশ নিয়ে অনেক মতভেদ হয়। অধিকাংশ গান টপ্পা হওয়াতে সুরগুলি এমনভাবে প্রযুক্ত হয়েছে যে তা মিশ্ররাগের আইনকানুনও অনেক সময় মানে নি। যেমন ভৈরবীর ক্ষেত্রে বলা

যায়। বাংলায় ভৈরবীতে প্রায়শই শুদ্ধ 'রে' লাগানো হয়েছে, এমন-কি শুদ্ধ 'নি'-ও যে বাদ গেছে তা নয়, তথাপি সব মিলিয়ে ভৈরবীর রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। বাংলায় পূরবীতে শুদ্ধ ধৈবত লাগানো একটি বিরুদ্ধ ব্যাপার ছিল না বরং সেটাই ছিল স্বাভাবিক; শুদ্ধ মধ্যমও উত্তমভাবে লেগেছে স্থানে স্থানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটি পূরবী। গৌড়ীরীতি শুদ্ধতার দিকে তেমন মনোযোগী হয় নি, কিন্তু আদলটা বজায় রেখে গেছে। সিন্ধু-ভৈরবী বলে চিহ্নিত বহু গান প্রচলিত আছে, কিন্তু এর ঠাট সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া কঠিন ব্যাপার, কেননা অনেক সময় এতে পিলুর আমেজ আসে, আবার অন্তরার দিকে কোনো কোনো গানে কালাংড়ার আভাস পাওয়া যায়। এ-সব রাগ সম্পর্কে এক-এক জন এক-এক রকম মত পোষণ করেন। বহু গানই কাফি বা সিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানাভাবে গাওয়া হয়ে এসেছে যথা, কি করে কলঙ্কে যদি (শ্রীধর কথক), পোড়া লোকে তারে বলে পর (শ্রীধর কথক), দে গো বৃন্দে আমায় দে নারী সাজায়ে (রসিক রায়); অন্নদার দ্বারে আজি (সাতুবাবু : আশুতোষ দেব) ইত্যাদি, শেষের গানটি অর্থাৎ 'অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত' গানটিকে সিন্ধু-কাফি বলাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। এটি ঝাঁপতালে নিবদ্ধ। সুদক্ষ গাইয়েরা এ গানটি গাইবার সময় ঝাঁপতালেও ছোটো ছোটো বোলতান করতেন। লয় রেখে এই-সব গান গাওয়া কঠিন ব্যাপার এবং সংগীতে মুনশিয়ানা না থাকলে এই-সব গাইতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। তবে, আবার বলি, সংগীত গেয়ে দেখাবার বিষয়, বলে বোঝাবার নয় এবং পুরোনো বাংলা গানে বহুক্ষেত্রেই সুরান্তর বর্তমান। সাতুবাবুর যে গানটির উল্লেখ করলুম সেটি হয়তো অনেকে ঝাঁপতালে গান না, এমন-কি সিন্ধু-কাফিতেও না শিখে থাকতে পারেন—বর্তমান লেখক যেভাবে এ-সব গান শুনেছেন তিনি কেবল সেইভাবে বিবৃতি দিতে পারেন। কিন্তু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে পুরাতন বাংলা গানে ঝাঁপতাল যথেষ্ট প্রযুক্ত হয়েছে এবং এই তালে গাইবারও কতকগুলি আর্ট ছিল যা প্রধানত বাংলা গানে দেখা যায়।

খাম্বাজের মতো এত জনপ্রিয় রাগ বোধ হয় বাংলার কোনোটি ছিল না। একজন প্রবীণ গায়ক কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে সারা জীবন খাম্বাজ গেয়েও তিনি এই রাগের কত বৈচিত্র্য আছে তা নির্ধারণ করতে পারেন নি। সেকালে যাঁরা বাংলা গান শিখেছেন তাঁরা তিনটি গান অবশ্যই জানতেন, একটি—ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে, দ্বিতীয়—তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এবং তৃতীয়—ননদিনী বোলো নাগরে। তিনটি গানের গাইবার কায়দা একই রকম এবং তিনটিই টপ্পা। সাধারণত খাম্বাজের যে 'সরগম' পরিচিত বা বাজনার গৎ-এ যে রীতি দেখা যায়, টপ্পার রীতি সে

রকমের নয়। বাংলা টপ্পায় সাধারণত খাম্বাজ গান্ধার থেকে আরম্ভ করা হয়, তার পর কিছু টপ্পার কাজ হয়ে সমের ঝোঁকটা পড়ে পঞ্চমে। তার পরে ধৈবতে আরোহণ ঘটে এবং কোমল নিষাদকে কেন্দ্র করে টপ্পার দানাগুলি লীলায়িত হয়ে মধ্যম পর্যন্ত নেমে আবার চড়ায় 'সা'-য় আরোহণ করে খাম্বাজের কায়দায় নামতে থাকে এবং পুনরায় গান্ধারে এসে কিছু জমজমার পর খাদের সা-তে প্রত্যাবর্তন ঘটে। এটি স্থানীয় বিশেষত্ব। অন্তরায় নিষাদ অত্যন্ত তীব্র এবং নিষাদ থেকে সা-তে আরোহণে অনেক কায়দাকানুন দেখা যায়। অনেকে নি-তে একটা সাসপেন্স তৈরি করেন যাতে শ্রোতা সা-তে পৌঁছোবার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করেন। তারপর কোমল নি লাগে ভারি সুন্দরভাবে এবং সেটি লাগে বক্রভাবে। খাম্বাজের টপ্পায় ধৈবতও বেশ তীব্রভাবেই লাগে কিন্তু অব্যবহিত পরের কোমল নিষাদ বেশ মধুর এবং মোলায়েমভাবে লাগানো হয়। বাংলা টপ্পা আজকাল এত অপ্রচলিত যে তরুণ সমাজের অনেকে হয়তো এই রীতির সঙ্গে আদৌ পরিচিতই নন। বহু-সংখ্যক টপ্পার মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গান মনে পড়ছে—যার বেশ-কয়েকটিতে কিছু বিশেষত্ব বর্তমান, যথা—পূজিব পীরিতি প্রেম (নিধুবাবু বা শ্রীধর কথক), বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা (নিধুবাবু বা শ্রীধর), সেই কালোরূপ সদা পড়ে মনে (শ্রীধর কথক), সে কেন রে করে অপ্রণয় (শ্রীধর কথক), আর মালা গাঁথ কি কারণ (গোবিন্দ অধিকারী) ইত্যাদি। এই গানগুলির মধ্যে শ্রীধর-রচিত 'সেই কালো রূপ সদা পড়ে মনে' গানটির মধ্যে একটি চমৎকার বিশেষত্বের সন্ধান পেয়েছিলুম। সেটি হচ্ছে এই গানে একটি সঞ্চারীর অস্তিত্ব। বাংলা টপ্পায় সঞ্চারীর সন্ধান কদাচিৎ মেলে—যদিচ একাধিক অন্তরার অস্তিত্ব প্রায়ই দেখা যায়। এই সঞ্চারীটিতে ঝিঁঝিটের অঙ্গ প্রবল, অর্থাৎ এক কথায় এই গানটিকে ঝিঁঝিট খাম্বাজ বলা চলে। ঝিঁঝিটের এমন মনোহর প্রয়োগ পুরাতন বাংলা গানের ভাণ্ডারেও দুর্লভ। ঝিঁঝিট বাংলার একটি অতি জনপ্রিয় রাগ ছিল, প্রায়ই এর নানাবিধ প্রয়োগ দেখা যেত। নিধুবাবুর 'ভাবিতেছিলাম যারে সেই আসি প্রকাশিল', শ্রীধর কথকের 'নয়নেরে দোষ কেন', 'প্রেম গেলে হাসবে লোকে' ইত্যাদি গানে ঝিঁঝিটের প্রয়োগ দেখা যায়। আমাদের প্রচলিত সপ্তকে গাইতে গেলে খাদের অংশে ঝিঁঝিটের কাজগুলি ভালো করে ফোটানো যায় না বলে অনেকে মধ্যম-কে 'সা' করে গাইতেন। এতে অনেক সময় অন্য একটি ধুনের আভাস পাওয়া যেত, কিন্তু ভালো করে শুনলে ঝিঁঝিটের বিশেষ লক্ষণটি সহজেই প্রতিভাত হত—বিশেষ করে খাদের 'সানিধাপা' বা কেবল মাত্র 'পাধাসা' অঙ্গে। বলা বাহুল্য, এই নিষাদটি কোমল নিষাদ। দু-একটি হোলির গান আছে যেগুলিতে খাম্বাজের সঙ্গে ঈষৎ পিলুর ছোঁয়া লেগেছে। উদাহরণস্বরূপ 'হোরি

খেলিবেন আজ শ্রীহরি' (মহারাজ মহতাবচন্দ) গানটির উল্লেখ করা যায়। এক-এক সময় এই গানটিকে ঠুংরি অঙ্গের বলে মনে হয়; অন্তত ঠুংরির বেশ-কিছু কাজ করার অবকাশ এ গানটিতে আছে; তথাপি এটি টপ্পা বলেই চিহ্নিত। এই গীতিকারেরই আর একটি এই ধরনের গান—'শ্রীহরি খেলিব হোরি আমরা গোপী সকলে।' এই-সব চালই আর নেই, তার সঙ্গে নৃত্যছন্দে সেই তালের প্রয়োগও অবলুপ্ত হয়েছে। আরো একটি গান মনে পড়ছে, এঁরই লেখা—'চল সবে বৃন্দাবনে যাই।' এটি সিন্ধুড়ায় গাওয়া হত। একদা এই রাগটির প্রচলন বাংলাদেশে যথেষ্ট ছিল, এখন আর শোনাই যায় না। এর বক্রগতিতে চলন এবং মধ্যসপ্তক থেকে তারসপ্তকে সংক্রমণ গানে একটা চমৎকার মেজাজ এনে দেয়। এই গানটিতে একটা খেয়ালের ভঙ্গিমা পাওয়া যায় এবং গায়ক ইচ্ছা করলে ঐ ধরনের গানকে খেয়াল করেও গাইতে পারেন। নিছক খাম্বাজের রীতিতেও যে কম পুরোনো বাংলা গান আছে এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ দয়ালচাঁদ মিত্রের রচনা 'কি কর কি কর শ্যাম নটবর' গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। একতালে মধ্যলয়ে অথবা দ্রুতলয়ে পুরোপুরি খাম্বাজের ঢঙে এই গানটি গাওয়া যেতে পারে।

প্রধান রাগগুলির মধ্যে একটি রীতিতে খুব আকৃষ্ট হয়েছিলাম, এটি গৌড়মল্লারকে অবলম্বন করে রচিত। এর তালও এমনভাবে বাঁধা যে তাতেও রাগটি যেন বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেছে। তালটি সাধারণ ত্রিতাল। কিন্তু আড়িতে চলেছে, যার ফলে একটা বিচিত্র দোলনভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য গৌড়মল্লার বলা হলেও মতভেদের অবকাশ আছে, কিন্তু এতে উক্ত রাগের আভাস যে বহুল পরিমাণে পরিস্ফুট এটি অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই রীতির কয়েকটি গান হচ্ছে—'কত ভালবাসি তারে' (শ্রীধর কথক), 'মিলন না হতে সই' (শ্রীধর কথক), 'কে তোমারে শিখায়েছে এ প্রেম ছলনা' (শ্রীধর কথক)। এক রচয়িতার রচনা অথবা এক গায়কীতে প্রতিফলিত বলেই বোধ হয় তিনটি গানের চলনই এক রকমের। এই গানগুলিও হয়তো অনেকে অন্যান্য রাগে শিখে থাকবেন কিন্তু গৌড়মল্লারের এই যে ধরনটির কথা বলা হল, এটি বাংলায় একটি বিশেষ শ্রেণী বলেই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। প্রেমের কতকগুলি আবেদন আছে যা মল্লার অঙ্গের গানে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই-সব গানে এবং তালের প্রয়োগও এই-সব অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে প্রচুর সাহায্য করেছে। পুরাতন বাংলার একটি জনপ্রিয় রাগ হচ্ছে সুরটমল্লার। এর সুর একেবারে ফর্মুলায় ফেলা, তবে কেউ কেউ দেশ রাগের আভাস একটু বেশি পরিমাণে আনতেন মাধুর্য বাড়াবার জন্য। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের 'দে গো মোহন চূড়া বেঁধে' বা 'কতদিনে হবে এ প্রেম সঞ্চার' গানগুলি এক সময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। কেউ কেউ এ-সব গান

খুব সাধারণভাবে গেয়ে যেতেন, আবার কেউ কেউ খুব মিষ্টি করেও গাইতে পারতেন—তবে এ-সব গানে তেমন তান বিস্তার করতে প্রায়ই দেখা যেত না। যাত্রা, পাঁচালির গানে সুরটমল্লার একটু বেশি দেখা যেত। দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে একটি বিশেষত্বসম্পন্ন সুরটমল্লার ছিল—'বল দেখি রে শুকশারী তোরা তো কুঞ্জেতে ছিলি'—গানটি ঝাঁপতালে একটি কাতর আবেদন ফুটিয়ে তুলত। এই ধরনের গানের গায়কী অন্যরকম। একটা অভিনয়ের ভাব থাকার জন্য ঠিক রাগসংগীতের ভঙ্গিতে এ-সব গান গাওয়া হত না, কিন্তু রাগের রূপ বা রস তাতে যে ব্যাহত হত এমন নয়। পুরোনো বাংলা গানে রাগসংগীতে প্রায়ই এরকম নাটকীয় ভঙ্গি দেখা যায়, যাতে সাবজেকটিভের চেয়ে অবজেকটিভ প্রকাশই অধিক পরিমাণে ঘটেছে। দাশু রায়ের পাঁচালিরই একটি বিখ্যাত গান—'ঐ দেখ আসছে আয়ান বংশীবয়ান কুঞ্জ মাঝে'; গানটির মূল সুর কালেংড়া, কিন্তু গানটি যখন শ্রোতারা শোনেন তখন কালেংড়া অথবা অন্য কোনো সুরের মিশ্রণ হয়েছে সেটি জানতে ইচ্ছে করে না, কেবল গানের ভঙ্গিটি উপভোগ করতে ইচ্ছে করে। গোপাল উড়ের যাত্রায় বহুবিধ কালেংড়া সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

বাংলার পুরোনো গানে পিলু এবং পিলু বারোঁয়া বেশ-কিছু পাওয়া যায়। এই সুরটি প্রধানত সেকালে সানাইওয়ালারা বাজাত বেশ মিষ্টি করে। এই ধরনের একটি সুন্দর গান শুনেছিলাম—'স্বপনে তাহার মনে হইল মিলন।' এটিকে পিলুখাম্বাজ বলাই বোধ হয় উচিত হবে। গানটি লিখেছিলেন সাতুবাবু। এঁর কয়েকটি রচনা শিল্পীমহলে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এই-সব গানে বেশ-খানিকটা ঠুংরির ছায়াপাত ঘটেছে। অতুলপ্রসাদ সেনের বিখ্যাত গান 'কে আবার বাজায় বাঁশি' বা 'ওগো আমার নবীন শাখি' কিছু-সংখ্যক পুরাতন বাংলা গানের সুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের প্রধান কবি-সুরকারদের মধ্যে অতুলপ্রসাদের রচনায় পুরাতন বাংলা গানের অনেক স্টাইল পাওয়া যায়। ঠিক এমনটি আর কারো গানে দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর 'যাব না যাব না যাব না ঘরে'—এই গানের ধরনও আমাদের প্রাচীন সংগীতে দুর্লভ নয়। একবার প্রখ্যাত টপ্পাগায়ক কালীপদ পাঠক এই লেখককে বলেছিলেন যে তিনি লখনউয়ে সেন মহাশয়কে কিছু প্রাচীন বাংলা গান শুনিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন তিনি ঐ-সব ধরনের পুরোনো বাংলা গান এর আগে আর শোনেন নি। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, বহুশ্রুত না হলে বাংলা গানের কতিপয় পুরাতন শৈলী তাঁর গানে এল কী করে? তবে কি এক সময় বাংলা গানে উত্তর-ভারতীয় পূর্বী ঢঙের বিচিত্র রীতিনীতির প্রভাব পড়েছিল? হয়তো হয়ে থাকবে কিন্তু কীভাবে তা

সম্পাদিত হয়েছিল তা আজ আর বলা সম্ভব নয়। যাই হোক, অতুলপ্রসাদের বহু গানের সঙ্গে পুরাতন বাংলা গানের বেশ-কিছু টেকনিকের মিল আছে—এমন-কি সে ক্ষেত্রে 'সফিস্টিকেশন' পর্যন্ত আছে বলে মনে হয় না। তিনি পুরোনো বাংলা গানের সঙ্গে গভীরভাবে না হলেও মোটামুটিভাবে যে পরিচিত ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই ধারণা হয়।

বাংলায় ব্যবহৃত বহু রাগের মধ্যে বেহাগের প্রয়োগ অতুলনীয়। বাংলার বেহাগে কোমল নি প্রায় সব গানেই লাগতে দেখা যায় এবং খাদের দিকে তিলককামোদের ধরনে 'পানিসারেগামা' অঙ্গটিও লাগে। একাধিক বাংলার প্রাচীন বেহাগে সঞ্চারীর প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'সখি শ্যাম না এল' গানটিতে এর ব্যতিক্রম হয় নি। একদা এই গানটি গায়ক-মহলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অবশ্য কেউ যদি গোঁড়া নিয়মে এ-সব গান গেয়ে থাকেন তা হলে বলবার কিছু নেই, কিন্তু আগের রীতিটি ছিল সাধারণ চলন। কালী মীর্জা-রচিত 'এমন নয়নবাণ কে তোমায় করেছে দান' গানটি খেয়ালের রীতিতে বেহাগে গাইতে শুনেছি। এতে কোমল-নি-র প্রয়োগ ছিল না। অধুনা প্রচলিত বেহাগের ঢঙেই এই গানটি গাওয়া হত। একাধিক সংগীত-সংগ্রহ গ্রন্থে এই গানটির সুর 'সিন্ধু ভৈরবী' দেওয়া আছে। হয়তো এর সুরান্তরও ছিল। বাংলার পুরোনো বেহাগে দুই মাধ্যমের ব্যবহারই দেখেছি, কেবল মাত্র শুদ্ধ মধ্যম প্রয়োগে গাইতে বড়ো একটা শুনি নি। শ্রীধর কথকের দুটি বিখ্যাত বেহাগ আছে, একটি 'সখি আমায় ধর ধর' অপরটি 'করি কি উপায়'। প্রথমোক্ত গানটি মেলডির দিক থেকে চমৎকার। এতে সঞ্চারী বর্তমান। দ্বিতীয়টি এমনভাবে গাওয়া হয়েছে যাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, কথকতার মধ্যে একটি বিশেষ ত্রস্ত ভাব ফোটাবার জন্য এটিতে সুর প্রয়োগ করা হয়েছে। এর সঞ্চারী অংশটিও খুব মধুর লাগে। এ-সব গানই কিন্তু পুরোপুরি কাব্যসংগীত, এগুলিতে রাগসংগীতের রীতিতে তানবিস্তার একটু বেশি পরিমাণে করলে রসহানি ঘটবার সম্ভাবনা। সাতুবাবুর রচিত 'হেরিব না কালো বরণ' গানটির মতো মনোহর বেহাগ পুরাতন বাংলা গানে খুব কমই আছে। এতে দুটি অন্তরা বর্তমান, সঞ্চারী নেই, কিন্তু ভালো করে গাইতে পারলে এতে এত অপূর্ব করুণ রসের সঞ্চার করা যায় যে শ্রোতার চোখ অশ্রুতে বিগলিত হয়ে ওঠে। বেহাগ খাম্বাজের নিদর্শনও কম নেই এবং এই মিশ্র রাগটিও শিল্পীদের খুব প্রিয় ছিল।

ভূপালীতে কালী মীর্জার একটি বিখ্যাত গান শোনা যেত—'বিপিনে বাজে বাঁশরি'। কোনো কোনো বইতে এর সুর দেওয়া আছে ভৈরোঁ; কিন্তু এই সুরে এই গানটি কাউকে গাইতে শুনি নি। এটিও খেয়ালের ঢঙে বাঁধা এবং বাংলা খেয়ালের

একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তবে এ গানটি শোনবার সময় এই লেখকের মনে হয়েছে এটিতে যেন বিভাসের রূপটিই বেশি করে প্রতিভাত হয়েছে। বিভাস বলে পরিচিত করলেও হয়তো এর রসহানির সম্ভাবনা নেই। বাংলার বিভাস একটি বিচিত্র রূপ। এর আরোহণ অবরোহণ অনেক সময় ঠিক ভূপালীর মতোই; আবার অবরোহণে নিষাদ লাগাবার রীতিও যথেষ্ট প্রচলিত। এর একটা গায়নভঙ্গি আছে যাতে একটা লোকসংগীতের আভাস ফুটে ওঠে, যেমন নীলকণ্ঠ-রচিত—'তোমায় হেরে অঙ্গ জ্বলে' গানটি। বহু আগমনীর গান বিভাসে গাওয়া হত। বাঙালি শিল্পীরা এই রাগটি এমনভাবে রূপায়িত করতেন যাতে কল্যাণ অঙ্গের ভূপালীর প্রভাব এর ওপর লক্ষিত হত না এবং সান্ধ্য আভাসের বদলে একটা রোদে-ঝলমল প্রভাতের আভাসই ফুটে উঠত। এই রাগের গায়কী আজ আর বাঙালি গায়কদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না বললে অত্যুক্তি হয় না। এটুকু লিখেই মনে পড়ল যাত্রাওয়ালা বদন অধিকারীর গান—'শ্যাম চরণ ছাড়িয়ে কেন দাও না'। এ গানটি যখন বিভাসে গাইতে শুনি তখন অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এর একটি অনুপম সঞ্চারীও ছিল। যাত্রার প্রয়োজনেই গানটি রচিত হয়েছিল বোঝা যায়, কিন্তু সুরকার যে বিভাসেরও একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন এতে রেখে গেছেন তা হয়তো তিনি নিজেও ততটা বোঝেন নি। আজ এ যুগে যখন এই-সব প্রাচীন সুর বা গায়কীর বিশ্লেষণ করা যায় তখন বোঝা যায় কত মানবিক আবেদনে পূর্ণ ছিল এইসব অভিনয়ে প্রযুক্ত গান। এ গানেরও সুরান্তর আছে বলে শুনেছি, কিন্তু সেটি কারো কাছে শুনি নি।

ভৈরবীর কথা বোধ করি বিশেষভাবে বলাই বাহুল্য। তাবৎ গীতিকারই বোধ হয় ভৈরবীতে কিছু-না-কিছু গান রচনা করে গেছেন। কিন্তু বাংলার ভৈরবী একেবারেই গোঁড়াভাবে চলে না, বিশেষ করে টপ্পায়। শুদ্ধ নি যদি বা কমই লেগেছে শুদ্ধ রে-র প্রয়োগ তো যত্রতত্র দেখা গেছে। সাতুবাবুর রচিত 'নয়নে আমার বিধি' গানটি ভৈরবীতে শুনেছি; যাঁর কাছে শুনেছি তিনি খাদের দিকে একটি চমৎকার অলংকার সহযোগে শুদ্ধ রে-র প্রয়োগ করতেন। বাংলায় এটি একটি বিশিষ্ট গায়কী। রবীন্দ্রনাথ ভৈরবী সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর কত গানে কত রকমে তিনি ভৈরবীর চমকপ্রদ নিদর্শন রেখে গেছেন। যখন নিজে গাইতেন তখন ছোটো ছোটো টপ্পার দানায় ভৈরবীর অপূর্ব কাজগুলি ফুটিয়ে তুলতেন। বিশেষ করে, তাঁর মধ্যম এবং কোমল গান্ধারের আন্দোলনের সঙ্গে কোমল রেখাব ছুঁয়ে সা-তে আসা—শুনলে রোমাঞ্চ জেগে উঠত। ভৈরবী ছাড়া জৌনপুরী, আশাবরী—এই দুটি রাগেও বেশ-কিছু গান এক সময় রচিত হয়েছে। নিধুবাবুর একটি গান আছে—'আমার নয়ন মানে না—সব বুঝালে কি হবে সই।' এ গান একাধিক সুরে গাওয়া হয়েছে। এই লেখক যাঁর কাছে শুনেছেন তিনি এ গানটিতে জৌনপুরীকে প্রধান রেখে ভৈরবী মিশিয়েছেন। এই মিশ্রণটি একটি অপূর্ব

জৌনপুরী ভৈরবীর নিদর্শন। গানটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল টপ্পার সঙ্গে কয়েকটি অসামান্য মীড়ের কাজ। টপ্পার তান এবং মীড় ঠিক হাত ধরাধরি করে চলে না কিন্তু এ গানে তার একটা সার্থক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই-সব বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বাংলা গানের বিচিত্র টাইপ। ভৈরোঁ রাগে কমলাকান্তের—'জান না রে মন পরম কারণ' একটি চমকপ্রদ সৃষ্টি। প্রায় ধ্রুপদের মতো গম্ভীর চালে গানটি চলেছে তার অপূর্ব প্রশান্তি নিয়ে। এতে কোমল নি-র প্রয়োগ আছে। ভৈরোঁতে কোমল নি অনেকেই একটু-আধটু লাগিয়ে থাকেন তার আবেদনটি অক্ষুণ্ণ রেখে। ঠিক এই গানের মতো আর-একটি রচনা পুরাতন বাংলা গানে খুব অল্পই মেলে। পরবর্তীকালে কালীকীর্তনে ধ্রুপদাঙ্গ অথবা বেশ গম্ভীরী চালের গান প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলি বাংলার শিল্পী-মহলে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি।

পুরাতন বাংলার আর-একটি বিশিষ্ট রাগ হচ্ছে ভীমপলশ্রী যাকে অনেক বইতে মূলতান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রসিক রায়-রচিত 'আয় মা সাধন সময়ে' বা 'কি হবে কি হবে ভবরাণী ভবে' আজও অনেকে গেয়ে থাকেন। রাধামোহন সেন একটি গান লিখেছিলেন—'কেন ভুরু ধনু টানো হানিবে কি বাণ?' এটিকে ভীমপলশ্রী রাগে মধ্যলয়ে খেয়ালের ঢঙে গাইতে শুনেছি, রীতিনীতি প্রায় আজকালকার মতোই, তবে গায়কীতে একটু প্রাচীনত্বের ছাপ ছিল এই যা। এই ধরনের গানগুলি কিন্তু আজও যাঁরা রাগপ্রধান গান করেন, তাঁরা অনায়াসে করতে পারেন।

আমাদের সংগীতে আজকে যেমন গানের রূপায়ণ সম্বন্ধে সচেতনতা এসেছে, এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তা ছিল না; শিল্পীরা অনেক সময় প্রচলিত সুরের পরিবর্তন করেছেন এবং গায়কীতেও পরিবর্তন এনেছেন। এর ফলে বিকৃতি কম ঘটে নি। একাধিক গ্রন্থে প্রচুর পরিশ্রম সহকারে এইরকম সংকলনের প্রয়াস দেখা যায়। এ সম্পর্কেও অনেকের অভিযোগ—এই-সব সংগ্রহ-গ্রন্থে অনেক সময় সম্পাদনার শ্রম বা ছাপার ভুলে বহু গোলমাল থেকে গেছে। অনেক সময়, এক গানের সুর তাল, আর-এক গানের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু গানের মূল রচয়িতা কে, এ নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ হয়ে এসেছে। যদি আমাদের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংগীতশিক্ষার একটা সুষ্ঠু সমন্বয় সাধিত হত তা হলে কেউ কেউ হয়তো প্রাচীন বাংলা গানের বিশিষ্ট রীতিনীতি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আমাদের সংগীতের ক্লাসিকাল যুগ যাতে অবহেলিত না থাকে, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত কার্যধারা অবলম্বন করতেন। সে ক্ষেত্রেই হয়তো পুরাতন গানে সেই পুরোনো স্টাইলকে আমরা কতকাংশে পেতুম, যাকে ভালগারিটি আবিল করে নি এবং যার একটা চিরন্তন বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য বর্তমান।